

শিক্ষকের আন্দোলন শিক্ষারই আন্দোলন

শিক্ষা

মির্জা তাসলিমা সুলতানা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাঙ্গিক কর্মবিরতি পালিত হলো কিছুদিন: কিন্তু কয়জন শিক্ষক তাঁদের চিন্তা ও কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে পেরেছিলেন? খোঁজ নিয়ে দেখুন, কর্মবিরতিতে থেকেও পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণ কিংবা গবেষণা শিক্ষার্থীর তত্ত্বাবধান তাঁরা বন্ধ রাখেননি। কিংবা তাঁরা প্রবন্ধ লেখা/গবেষণাকাজও থামাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে শিক্ষকেরা জানেন যে শিক্ষকতার কর্মঘণ্টা আট ঘণ্টায় নির্ধারিত নয়, বরং তা চব্বিশ ঘণ্টা। শিক্ষকেরাই শিক্ষকতার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা প্রশাসনে এবং গবেষণাকাজ করেন। শিক্ষার্থীর যেকোনো প্রয়োজনে যেকোনো সময় নানা রকমে সাহায্য করেন। সেসব শিক্ষক আনন্দের সঙ্গেই করেন, ঢোল পিটিয়ে তার জন্য বাহবা আকাজক্ষা করেন না। এও অবশ্য বলা প্রয়োজন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কিছু শিক্ষক কিন্তু আছেন, যারা কোনো ঘটনাই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য বরাদ্দ রাখেন না। সে অনিয়ম প্রকাশ ও তা নিয়ে সবার সোচ্চার থাকা জরুরি বলে মনে করি। কিন্তু তাই বলে নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের সংখ্যা ভুলে যাওয়া কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়।

শিক্ষকেরা শিক্ষক সমিতিগুলোতে কিংবা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসছিলেন, সেগুলো লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়, কিছুদিন ধরে চলা এই আন্দোলন ও এর দাবিদাওয়াগুলো তাঁদের আকাজক্ষার প্রতিফলন নয়। শিক্ষকদের মূল দাবি একেবারেই স্বতন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত আছে দুটো কাজ—শিক্ষকতা ও গবেষণা। একজন শিক্ষক কতজন শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে পাঠদান ও পাঠদানের পর শিক্ষণে যথাযথভাবে সহায়তা করতে সমর্থ, কিংবা একজন শিক্ষক কতগুলো খাতা একসঙ্গে গুণগত মান বজায় রেখে পরীক্ষণ করতে পারেন, এ নিয়ে ভাবা হয়নি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের হতাশা রয়েছে। অথচ ফি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকসংখ্যা বাড়েনি। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা ও দুর্বলতা পরিমাপ করে তাকে সহায়তার সব ব্যবস্থা এখন পাশ্চাত্যের দেশগুলো তো বটেই, আশপাশের অনেক দেশেই রয়েছে। এই দেশে নেই। এ জন্য উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে বিস্তারিত ও ধারাবাহিকভাবে গবেষণা প্রয়োজন, অথচ তা হয়নি।

গুণ উচ্চশিক্ষা কেন, কোনো প্রসঙ্গেই যথাযথ ও ধারাবাহিক গবেষণা হয় না, তার কোনো ব্যবস্থা কোথাও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণার সামর্থ্যকে রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় পুরোটাই অব্যবহৃত রেখেছে। অথচ শিক্ষকদের অনেকেরই গবেষণা করার তৃষ্ণা আছে। সত্যি কথা বলতে, আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটাই স্পষ্ট হয়নি। শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান অনেক কিছুকে প্রেমের মধ্যে রাখাই এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ। চলতি পরিস্থিতির ফাঁকফোকর বের

করে নতুন জ্ঞান তৈরিই হলো এ প্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য। সম্ভবত এখানেই সমস্যা। মনে হয় বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতিকে এবং চালু ধ্যান-ধারণাকে স্থায়ী করতে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। ফলে 'বিশ্ববিদ্যালয়' ধারণার বিদ্যমানতাকে প্রশ্ন করার সামর্থ্য ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তি হয়তো তাঁদের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানের এখনো যে যৎসামান্য সম্ভাবনা আছে, তাকেও মনে হয় রুদ্ধ করতে চায় শাসকগোষ্ঠী। প্রতিদিন নব নব রাস্তায় ও ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হেয় করার কারণ সম্ভবত সেটাই।

তবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্মিলিত সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ভূমিকা পর্যালোচনার দাবি রয়েছে। তাঁরা রাষ্ট্রের ঘোষিত বেতনকাঠামোতে অধ্যাপকদের অবস্থানের অবনমন নিয়েই কেবল অসন্তুষ্ট। সচিবরা কী পেলেন ও তাঁরা কী পেলেন না তুলনায় এনে, যা নয় তা বলার সুযোগ অনেককে করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তো রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার কাজে যুক্ত নন, তদুপরি তাঁরা রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার অধীনও নন। আগেই বলেছি, শিক্ষকের কাজের ধরন, কর্মঘণ্টা কোনো কিছুই সচিবদের বা ব্যবস্থাপকের মতো নয়। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকারের ঘোষিত ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্সি অধ্যাপকেরা সচিবদের সমপর্যায়ের ছিলেন। বেতনকাঠামোর বিন্যাসেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্য থেকে শতকরা ২৫ ভাগ সিলেকশন গ্রেড পেতেন, সচিবদের বেতন এই স্কেলেরই ছিল। এবারের ঘোষিত ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্সি সরাসরি শিক্ষকদের অবস্থান বলা নেই, বরং ৭ নম্বর ধারায় বলা আছে যে এই প্রেসিডেন্সি শুধু রাষ্ট্রীয় কাজে ও সেরেমনিয়াল অর্থে অর্থপূর্ণ, প্রতিদিনের কাজে ব্যবহারিক অর্থে এর কোনো গুরুত্ব নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত প্রস্তুত শিক্ষার্থী পেতে হলে, স্কুল-কলেজের শিক্ষকের বেতনও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক কথায়, সমগ্র শিক্ষার প্রতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির পরিবর্তন দরকার। শুধু কথার কথা না, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের সাত ভাগের বেশি হওয়া প্রয়োজন, যা এখন মাত্র দুই ভাগেরও কম

তবে সম্প্রতি ঘোষিত বেতনকাঠামোকে অনেকগুলো গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে এবং টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড আগের মতো না থাকতে অধ্যাপকেরা কখনো আর দ্বিতীয় বা প্রথম ধাপের বেতন-ভাতা পেতেন না। আদি দশাতে ফিরে যেতেই চলছিল আন্দোলন, যা স্থগিত হলো। এখন নাকি অধ্যাপকদের ৩ নম্বর গ্রেড থেকে ২ ও ১ নম্বর গ্রেডে যেতে পদোন্নতির সোপান তৈরি করা হবে! অধ্যাপক বা প্রফেসরের প্রফেস করার কথা, ইংরেজি এই শব্দের সমার্থ শব্দগুলো হলো: ক্রেইম, এসার্ট, এফার্ম, স্টেইট, প্রটেষ্ট ইত্যাদি। মোদা কথায়, অধ্যাপকের পদ যিনি অর্জন করবেন, তিনি নির্ভীক ঘোষণা/বিবৃতি দিতে সক্ষম। এখন সোপান ডিঙানোর এই মারপ্যাঁচে কি তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার বিধি তৈরি হচ্ছে? শিক্ষকদের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি অতীব জরুরি। শিক্ষকের স্বতন্ত্র বেতন স্কেলই তাই প্রথম দাবি হওয়া উচিত, যে বেতন পেলে তাঁরা দৈনন্দিন খরচের হিসাবনিকাশ নিয়ে পেরেশান থাকবেন না। এ ছাড়া গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্যও পদক্ষেপ নিতে হবে, সেই জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ রাষ্ট্রেরই করতে হবে। আগের বেতন স্কেলের সম অবস্থান ফিরে পাওয়ার আকাজক্ষা, স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবিকে অগ্রাধিকার না দেওয়া ছিল এই আন্দোলনের প্রধান বার্থতা। এ ছাড়া দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাব্যয় নিয়ে শিক্ষক ফেডারেশনের কোনো বক্তব্য না থাকাও ছিল মর্মান্তিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত প্রস্তুত শিক্ষার্থী পেতে হলে, স্কুল-কলেজের শিক্ষকের বেতনও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এককথায়, সমগ্র শিক্ষার প্রতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির পরিবর্তন দরকার। শুধু কথার কথা না, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ৭ শতাংশের বেশি হওয়া প্রয়োজন, যা এখন মাত্র ২ শতাংশেরও কম।

পূর্ণ সমর্থন না থাকলেও দেশের ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিলেন। রাষ্ট্রের নির্বাহীরা বেতনকাঠামোয় শিক্ষকদের অবস্থানের অবনমন করেই ক্ষান্ত হননি, বক্তৃতা-বিবৃতিতে শিক্ষকদের খাটো করতে চেয়ে তাঁদের ক্ষুব্ধ করেছেন। এককভাবে নয়, নীতিগত অর্থেই এবং পরিকল্পিতভাবে এই তাল্ছিয়া করেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্বব্যাপ্তির তত্ত্বাবধানে ২০ বছরের কৌশলপত্র করা হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র হরণ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়া। তারই ধারাবাহিকতায় সম্ভবত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা হরণের প্রক্রিয়া চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের অর্থায়নের জন্য চাপে রেখে জনগণের প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শিক্ষার ব্যয় বাড়ানো ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় আয় করবে কোথেকে? মাছ চাষ করে বা মার্কেট বানিয়ে আয় করা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়। একসঙ্গে দাঁড়ানো ছাড়া শিক্ষকের শিক্ষাকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই। তাই ধারণা করি, শিক্ষকের এ আন্দোলন অচিরেই শেষ হচ্ছে না।

● মির্জা তাসলিমা সুলতানা : সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।